# ডিজিটাল নির্বাচন : নতুন প্রেক্ষাপট

মোস্তাফা জব্বার

অবশেষে ডিজিটাল যন্ত্রে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়টি মূল স্রোত হিসেবে আলোচনায় এসেছে। ধারণা করা হচ্ছে, ২০১৯ সালের নির্বাচন ডিজিটাল ভোটিং যন্ত্রে অনুষ্ঠিত হবে। বছরের পর বছর বিষয়টি নিয়ে লেখালেখি করার পরও একে আমরা মূল স্রোতে আনতে পারিনি। বিদায়ী নির্বাচন কমিশন আর যাই করুক নির্বাচনে প্রযুক্তি ব্যবহারের সাহস দেখাতে পারেনি। অবশেষে তিনিই সেই সাহসটি করেছেন, যার সেটি করার কথা। ২০১৭ সালে নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন করার সময় আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতির কাছে ডিজিটাল নির্বাচনের দাবি পেশ করা হয়েছে। কাকতালীয় হলেও এটিই বাস্তবতা যে দেশে এত রাজনীতিক থাকতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাই জাতিকে আবারও সামনে চলার পথ দেখালেন। আগেও তিনিই পথ দেখিয়েছেন। আজকের বাংলাদেশ তার হাতে গড়ে ওঠা এক অনন্য রাষ্ট্র।

কেউ বোধহয় এটিও মনে রাখেননি আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাই ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়নের দাবি তুলেছিলেন, যা তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাস্তবায়িত করেছিল। ডিজিটাল যন্ত্রে নির্বাচন প্রশ্নে ১৭ ফেব্রুয়ারি দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় শীর্ষ শিরোনাম হিসেবে আলোচনায় আসে। খবরটি এ রকম– 'আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণের প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনতে চায় নির্বাচন কমিশন। কাগুজে ব্যালটের পরিবর্তে যন্ত্রের মাধ্যমে ভোট নেয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। যন্ত্র তৈরির কাজও অনেকটা এগিয়েছে। যন্ত্রটির সম্ভাব্য নাম ডিজিটাল ভোটিং মেশিন (ডিভিএম)। বাংলাদেশে কয়েকটি স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ছোট আকারে ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন বা ইভিএমের নতুন রূপই হলো ডিভিএম।

তবে এই পদ্ধতি নিয়ে সরকারি দল আওয়ামী লীগ ও প্রধান বিরোধী দল বিএনপির অবস্থান দুই দিকে। আওয়ামী লীগ ই-ভোটিংয়ের পক্ষে থাকলেও বিএনপি এটিকে দেখছে কারচুপির যন্ত্র হিসেবে। গত ১১ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতির সাথে সংলাপে আওয়ামী লীগ যন্ত্রে ভোট নেয়ার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানায়। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, মানুষের ভোটাধিকার অধিকতর সুনিশ্চিত করার স্বার্থে আগামী সংসদ নির্বাচনে ই-ভোটিং চালু করার পরিকল্পনা বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। তবে এর প্রতিক্রিয়ায় বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী প্রথম আলোকে বলেন, এটি দুরভিসন্ধিমূলক। নির্বাচনে কারসাজি করতে ভোটগ্রহণে যন্ত্রের ব্যবহার সরকারের একটি নতুন চাল। নিরক্ষর মানুষের ভোট নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার এটি করতে চাইছে। আগের শামসুল হুদা কমিশন ইভিএম পদ্ধতিতে ভোট নেয়ার পরিকল্পনা করেছিল। আর সদ্য বিদায়ী রকিব কমিশন ডিভিএম পদ্ধতির কথা বলেছিল। তবে দুটি প্রায় একই। ডিভিএম পদ্ধতিতে কী কী সুবিধা জানতে চাইলে নির্বাচন কমিশনের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কমিটির একজন বিশেষজ্ঞ প্রথম আলোকে বলেন, ইভিএমে যেকেউ যে কারও ভোট দিতে পারতেন। ধরার উপায় ছিল না। কিন্তু ডিভিএমে সেই সুযোগ থাকবে না। এখানে বায়োমেট্রিক (আঙুলের ছাপ) পদ্ধতিতে ভোটারের পরিচয় নিশ্চিত করা হবে। প্রথমে একজন ভোটার ওই যন্ত্রে আঙুলের ছাপ দেবেন। জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) ডাটাবেজের সাথে ভোটারের আঙুলের ছাপ মিলিয়ে তার পরিচয় নিশ্চিত করা হবে। আঙুলের ছাপ মিললে ভোটার ভোট দিতে পারবেন। ওই ভোটার একটি ভোট দেয়ার সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যন্ত্রটি বন্ধ (লক) হয়ে যাবে। এরপর ওই ভোটার আর কোনোভাবেই আরেকটি ভোট দিতে পারবেন না। তা ছাড়া ডিভিএমে স্মার্ট কার্ড প্রবেশ করিয়েও ভোটারের পরিচয় শনাক্ত করার ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। নির্ধারিত ভোটার ভোটকেন্দ্রে না গেলে বা কেন্দ্র দখল করে কোনো ভোটারের ভোট অন্য কারও পক্ষে দেয়ার সুযোগ থাকবে না। ভোটগ্রহণের আগের রাতে ব্যালটে সিল মেরে বা বাক্সে ফেলার কোনো উপায় থাকবে না। এ ছাড়া আরেকটি সুবিধা হলো, আগের প্রস্তাবিত ইভিএম মেশিনের কারিগরি ত্রুটির কারণে ভোটের তথ্য মুছে যেত। কিন্তু ডিভিএমে এই সুযোগ থাকছে না। এখানে মেশিনের কারিগরি ত্রুটি হলেও এর সর্বশেষ তথ্য সংরক্ষিত থাকবে। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের এক কর্মকর্তা বলেন, এটা হবে অনেকটা উড়োজাহাজের 'ব্ল্যাকবক্স'-এর মতো। মেশিনের যত সমস্যাই হোক, সব তথ্য এখানে সংরক্ষণ করা হবে। মেশিন বিদ্যুতে চলবে। তবে ব্যাকআপ হিসেবে ব্যাটারিও থাকবে। যেসব স্থানে বিদ্যুৎ নেই, সেখানে ব্যাটারিতে চলবে। ২০১৬ সালের ২৫ জুলাই নির্বাচন কমিশনের এক বৈঠকে যন্ত্রে ভোট নেয়ার নতুন প্রযুক্তি ডিভিএম সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন জাতীয় পরিচয়পত্র প্রণয়ন ও বিতরণ অনু বিভাগের তৎকালীন মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সুলতানুজ্জামান মো: সালেহউদ্দিন। এরপর সদ্য বিদায়ী কমিশন গত বছরের অক্টোবরে ১৯ জন প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদের সমন্বয়ে একটি কমিটি করে। ডিভিএম কেমন হবে, আগের ইভিএমের তুলনায় ডিভিএমে কতটা বেশি সুবিধা থাকবে, ভোটগ্রহণ প্রশ্নহীন হবে কি না, সে ব্যাপারে মতামত দেবে কমিটি। কমিটির উপদেষ্টা অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী। কমিটির মতামত ইতিবাচক হলে চলতি বছরই পরীক্ষামূলকভাবে যন্ত্রটি ব্যবহার করা হতে পারে। জানতে চাইলে অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যন্ত্রে ভোট নেয়া হচ্ছে। তবে অভিযোগ আছে, চেষ্টা করা সত্ত্বেও যন্ত্রে ভোট দেয়াকে সম্পূর্ণ নিরাপদ করা যায়নি। তাই এটি খুব সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে। এখানে শুধু যন্ত্রের ব্যবহার রাখলে চলবে না। কাগজের ব্যবহার থাকতে হবে। সাবেক নির্বাচন কমিশনার এম সাখাওয়াত হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, যন্ত্রে আগে থেকে কারসাজি করার কোনো সুযোগ নেই। একটি ভোটের জন্য একবারই প্রোগ্রামিং (ওটিপি) করা হয়। ভোট শুরুর আগে কোনো যন্ত্রে কারসাজি করা হলে সেটা তো আর কাজই করবে না। একেকটি যন্ত্র তৈরিতে তখন ব্যয় ধরা হয়েছিল সম্ভবত ২৪ হাজার টাকা, যা দিয়ে তিনটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন করা যেত। ফলে ব্যালট ছাপানো, কালি, কলম, ব্যালট বাক্স কেনার খরচ বাঁচত। সময় তো বাঁচতই। তিনি বলেন, যন্ত্রে কাগজের ব্যবহার রাখা যেতে পারে। এই প্রক্রিয়াকে ভিভিপিএটি বা ভোটার ভেরিফিকেশন পেপার অডিট ট্রেইল বলা হয়। এতে অভিযোগ উঠলে মেশিন থেকে ভোটের তথ্য নেয়া যাবে। শামসুল হুদা কমিশন ইভিএমে ভোট নেয়ার উদ্যোগ নেয়। সে সময় এ কাজে বুয়েট ও বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরিকে সম্পৃক্ত করা হয়। ২০১০ সালে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচনে একটি ওয়ার্ডে প্রথমবারের মতো ইভিএম ব্যবহার করা হয়। ওই কমিশন নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ৯টি ওয়ার্ডে ও কুমিল্লা সিটি করপোরেশন নির্বাচনে সব ওয়ার্ডে ইভিএম ব্যবহার করে। মূলত ভোট গণনার সময় কমিয়ে আনতে, ব্যালট ছাপানোর ঝামেলা কমাতে এবং ভোট কারচুপি বন্ধ করতে এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। সদ্য বিদায়ী রকিব কমিশন কয়েকটি স্থানীয় সরকার নির্বাচনে পরীক্ষামূলকভাবে ইভিএম ব্যবহার করে। ২০১৩ সালের ১৫ জুন রাজশাহী সিটি করপোরেশন নির্বাচনের সময় সেখানকার টিচার্স ট্রেনিং কলেজে ইভিএমে ভোটগ্রহণ করা হয়। কিন্তু সেখানে কিছু অভিযোগ উঠলেও ভোট পুনরায় গণনার কোনো সুযোগ ছিল না। তারপর থেকে কমিশন ইভিএম ব্যবহারে পিছু হটে। ওই সময় নির্বাচন কমিশন ও বুয়েটের মধ্যে এই মেশিন নিয়ে টানাপড়েন শুরু হয়। এ কারণেও ইভিএমের কাজ স্থগিত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় গত বছরের জুলাইয়ে ইসি নিজেদের আইসিটি শাখার লোকবল দিয়ে ইভিএমের নতুন ▸

প্রটোটাইপ (নমুনা) নিয়ে আসে। সদ্য বিদায় নেয়া নির্বাচন কমিশনার মো: শাহনেওয়াজ বলেন, ডিভিএমে ভোট নেয়ার বিষয়টি এখন কারিগরি কমিটির মতামতের অপেক্ষায় আছে। তারা কিছু কাজ এগিয়ে রেখেছে। এই মেশিন নিয়ে যাতে কোনো বিতর্কের সুযোগ না থাকে, সে জন্য কী ধরনের ব্যবস্থা নেয়া যায় তা কমিটি দেখবে। কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হবে। জানতে চাইলে বর্তমান নির্বাচন কমিশনের সচিব মো: আবদুল্লাহ প্রথম আলোকে বলেন, ২০১৯ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ডিভিএম পদ্ধতিতে ভোটগ্রহণের চিন্তা চলছে। এ জন্য ইতোমধ্যে একটি শক্তিশালী কমিটিও করা হয়েছে। তার মতে, ডিভিএম এমন একটি যন্ত্র, সেখানে কারচুপির কোনো সুযোগ থাকবে না। ভোটের নিরাপত্তা শতভাগ নিশ্চিত হবে। ভোটারের দেয়া সর্বশেষ তথ্যগুলো সংরক্ষিত থাকবে। তবে শেষ পর্যন্ত ডিভিএম চালু হবে কি না, তা নির্ভর করছে কমিটির সিদ্ধান্তের ওপর।'

দৈনিক প্রথম আলোতে সকল পক্ষের বক্তব্য যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তাতে ডিজিটাল ভোটগ্রহণ নিয়ে ধারণাটি স্পষ্ট হওয়ার কথা। আলোচনায় এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, সকল বিশেষজ্ঞের মতামতের বাইরে বিএনপি যুক্তিহীনভাবেই ডিজিটাল ভোটদানের বিরোধিতা করছে। বিএনপির এই প্রবণতা নতুন নয়। তথ্যপ্রযুক্তি তাদের পছন্দের বিষয় নয়। তাদের শাসনকালে বাংলাদেশকে তথ্যপ্রযুক্তিতে পিছিয়ে নেয়ার যত আয়োজন করার তার সবই করা হয়েছে। ১৯৯২ সালে সাবমেরিন ক্যাবলে যুক্ত না হওয়া থেকে কালিয়াকৈরের হাইটেক পার্কের জমি তারেক রহমানের খাম্বা লিমিটেডের দখলে দেয়া পর্যন্ত নেতিবাচক সব কাজের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তারাই পাবে।

এই প্রসঙ্গে একদম শুরুতেই ডিজিটাল নির্বাচন বিষয়ে একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করছি– ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির মতে, মার্কিন নির্বাচনে ২০০৪ সালে ২০০০ সালের চেয়ে অন্তত ১০ লাখ ভোট বেশি গণনা হয়েছিল। এর কারণ হচ্ছে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন কাগজভিত্তিক যন্ত্রের চেয়ে এই ভোটগুলো অতিরিক্ত শনাক্ত করতে পেরেছিলো। [24] https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_voting)

খুব সঙ্গত কারণেই ভোট শনাক্ত করা ও গণনা করার কায়িক পদ্ধতিতে সনাতনী ধারায় যে ত্রুটি রয়েছে আমেরিকার নির্বাচনের এই তথ্যটিতে সেটি স্পষ্ট হয়েছে।

ওরা তো কাগজের ব্যালট গণনার মেশিনের কথা বলেছে। আমরা ট্রেডবডির নির্বাচনে এখন তেমন প্রযুক্তি ব্যবহার করি। ২০১৬ সালে জাতীয় প্রেসক্লাবের নির্বাচনে আমি সেই প্রযুক্তি ব্যবহার করেছি। সেখানে দেখেছি ভোটার গণনা যন্ত্র শতভাগ দক্ষতার সাথে শতভাগ ভোট শনাক্ত করতে পারে– কায়িক পদ্ধতিতে সেখানে ভুলের পরিমাণ ছিল শতকরা ৩৩ ভাগ। আমরা এখন বিসিএস বা বেসিসের নির্বাচনেও কাগজের ব্যালট মেশিন দিয়ে গুনি। তবে আমরা তো জাতীয় নির্বাচনে সেই স্তরেও উঠতে পারিনি। বরং এখনও হাতে গুনে গুনে ভোটের হিসাব করি। প্রথম আলোর খবরে বাংলাদেশে ডিজিটাল ভোটিং মেশিন ব্যবহারের ইতিহাসটা পাওয়া গেছে। আমরা এটিও জেনেছি যে, মূলত জামিলুর রেজা চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন একটি কারিগরি কমিটির মতামতের ওপর নির্ভর করছে সামনের নির্বাচনে ডিজিটাল ভোটিং মেশিন ব্যবহার হবে কি না। জেআরসির মন্তব্যে কিছুটা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থাকলেও আমি আশা করি তিনি ও তার টিম দেশটাকে ডিজিটাল যুগে যাওয়ার পথেই নিয়ে যেতে চাইবেন। ডিজিটাল ভোটিং মেশিন তাকে সামনে যাওয়ার পথ দেখাবে সেটিও আমি বিশ্বাস করি।

বস্তুতপক্ষে নির্বাচনের ডিজিটাল ধারাটির জন্য প্রথম প্রত্যাশার জন্ম নেয় ফখরুদ্দিনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছেই। তার সরকার যখন ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়নে সক্ষম হয় তখন এই প্রত্যাশা আমাদের ছিল যে, সেই ভোটার তালিকার ভিত্তিতে একটি যান্ত্রিক ভোটদান পদ্ধতি তারা প্রবর্তন করবে। কিন্তু সেটি তারা করে যেতে পারেনি। এরপর বহু বছর ধরে নির্বাচন কমিশন নানাভাবে নির্বাচনকে ডিজিটাল করার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। কিন্তু তারাও বস্তুত সাহস করতে পারেনি।

**ডিজিটাল নির্বাচন ও তার প্রেক্ষিত :** ১৯৬০ সালে পাঞ্চ কার্ড (কমপিউটারের ডাটা সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত এক ধরনের পদ্ধতি) প্রস্তুত হওয়া শুরু হলেই ইলেকট্রনিক ভোটিং পদ্ধতির ধারণার জন্ম হয়। তবে জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে পাঞ্চ কার্ড ভোটিং পদ্ধতি তেমন জনপ্রিয়তা পায়নি। এরপর প্রচলিত হয় ডিআরই (ডাইরেক্ট রেকর্ডিং ইলেকট্রনিক) পদ্ধতি। এটি বেশ জনপ্রিয়। দুনিয়ার অনেক দেশ এখন এটি ব্যবহার করে। ই-ভোটিংয়ের আরেকটি ধরন হলো কাগজভিত্তিক। একে ডকুমেন্ট-ব্যালট ভোটিং সিস্টেমও বলা হয়। এখন পর্যন্ত যেসব ক্ষেত্রে জাতীয় নির্বাচনে ই-ভোটিং পদ্ধতি চালু করা হয়েছে এবং অব্যাহত রয়েছে, তাতে ডিআরই পদ্ধতিই ব্যবহার করা হয়েছে। এই ডিআরই পদ্ধতিতে ভোটদান এরই মাঝে কিছু কিছু দেশে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ব্রাজিলে এই পদ্ধতিটি সর্বাধিক প্রচলিত।

**ভারতের অভিজ্ঞতা :** ভারতের দুটি সরকারি প্রতিষ্ঠান ব্যাঙ্গালোরের ভারত ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড ও হায়দরাবাদের ইলেকট্রনিক্স কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া ১৯৮৯-৯০ সালে উৎপাদিত ইভিএমের (ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন) মাধ্যমে মধ্যপ্রদেশ (৫টি আসন), রাজস্থান (৫টি আসন) ও দিল্লির (৬টি আসন) মোট ১৬টি আসনে ভোটগ্রহণ করে ১৯৯৮ সালে। ২০০৪ সালে এই ভোটগ্রহণের আওতা আরও বাড়ানো হয়।

যে যন্ত্রটি দিয়ে ভারত ই-ভোটিং করে তার প্রযুক্তি খুব সাধারণ ছিল। এর জন্য জাপান থেকে প্রসেসর আমদানি করা হয়। সেই প্রসেসরে নতুন কোনো তথ্য প্রবেশ করানো যায় না। মোট দুটি অংশে বিভক্ত থাকে এই যন্ত্রটি। একটি ব্যালট অংশ। এটির সহায়তায় ভোটার ভোট দেন। অন্য অংশটিতে ভোটের তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। এই যন্ত্রগুলো ব্যাটারিচালিত। প্রতিটি যন্ত্র মোট ৩৮৪০টি ভোটগ্রহণ করতে পারে। একটি যন্ত্রে ১৬ জন করে মোট ৬৪ জন প্রার্থীর ভোট দেয়ার ব্যবস্থা করা যায়। এই যন্ত্রে কেউ একবার ভোট ▸

ওখানকার সবাই জাতীয় নির্বাচনে এই পদ্ধতিতে ভোট দেয়। আমাদের পাশের দেশ ভারতে এই পদ্ধতি ১৯৯৮ সাল থেকেই চালু আছে। ২০০৪ সালেও ভারত এই পদ্ধতিতে নির্বাচন করেছে। বড় দেশ বলে তারা পুরো দেশটাতে এখনও এই পদ্ধতিতে নির্বাচন চালু করতে পারেনি। ভারত ছাড়াও নেদারল্যান্ডস, ভেনেজুয়েলা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও ই-ভোটিং চালু আছে। ডিআরই পদ্ধতি ছাড়াও এস্তোনিয়া এবং সুইজারল্যান্ডে ইন্টারনেট ভোটিং চালু আছে। সম্ভবত ইন্টারনেট ভোটিংই হবে এক সময়ে ভোট দেয়ার সবচেয়ে কার্যকর পন্থা। তবে তার আগে দূর করতে হবে আরও অনেক সমস্যা।

ইলেকট্রনিক ভোটিং নিয়ে ব্যাপকভাবে কাজ হয়েছে ব্রাজিলে। সেই দেশটিতে ১৯৯৬ সালে ৫০টি পৌরসভায় এই যন্ত্র পরীক্ষা করা হয়। ২০০০ সাল থেকেই তারা এটি ব্যবহার করে আসছে। ব্রাজিলে ২০১০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সাড়ে ১৩ কোটি ভোটার ছিলেন। সেই নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করতে মাত্র ৭৫ মিনিট সময় লেগেছে।

দিলে যন্ত্রটি লকড হয়ে যায় এবং যতই চেষ্টা করা হোক এতে দ্বিতীয় ভোট ততক্ষণ দেয়া যাবে না যতক্ষণ আবার ভোট দেয়ার জন্য সেটি আনলক করা হবে না। এই যন্ত্রগুলোর রেকর্ড অমোচনীয়। ফলে প্রয়োজনে পুনর্গণনা করা যায়।

**ডিজিটাল ভোটিংয়ের ভালো-মন্দ :** ডিআরই পদ্ধতির সমালোচকেরা বলেন, এর ফলে জাল ভোট সম্পূর্ণ বন্ধ করা যায় না। বিশেষ করে ভোটার তার ভোট দেয়ার কোনো প্রমাণপত্র হাতে পান না বলে সন্তুষ্টির প্রশ্ন থেকে যায়। আমেরিকায় এই পদ্ধতির সমালোচনা করতে গিয়ে বলা হয়, DRE machines must have a voter-verifiable paper audit trails। ভারতে এই পদ্ধতির সমালোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, এর ফলে কোন এলাকার ভোটারেরা কাকে কম বা কাকে বেশি ভোট দিয়েছেন তা জানা যায়। তবে সারা দুনিয়ার যেখানেই ই-ভোটিং চালু হয়েছে সেখানেই এর সুফলগুলো খুব স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। সম্পূর্ণভাবে বন্ধ না হলেও ডিআরই পদ্ধতিতে জাল ভোট, ভোটকেন্দ্র দখল ইত্যাদি প্রায় অনেকটাই বন্ধ করা যায়। ভোটিং মেশিনে ভোটদানের সুবিধার মাঝে আছে খুব দ্রুত ভোট গণনা করতে পারার ব্যাপারটি। এটিকে সবার আগেই উল্লেখ করা যায়। এই ব্যবস্থায় আমাদের দেশের ভোট গণনার প্রচলিত নিয়ম অনুসারে ভোটকেন্দ্রে ভোট গণনা করতে কয়েক মিনিট সময় লাগবে মাত্র। এর অর্থ দাঁড়াবে, ভোটগ্রহণ শেষ করার সাথে সাথে ফলাফল দেয়া যাবে। কোন এলাকায় কে বেশি আর কে কম ভোট পেলেন সেটি আমাদের প্রচলিত পদ্ধতিতে জানা যায়। ফলে ভারতে যে কারণে ভোটিং মেশিন সমালোচিত, সেটি আমাদের জন্য প্রযোজ্য হবে না। অনেকেই মনে করেন, মেশিনে ভোট দেয়াটা আমাদের মতো 'অশিক্ষিত' মানুষের দেশে জটিলতা বাড়াবে। কিন্তু তারা হয়তো ভারতের কথা মাথায় রাখেননি। ভারতে প্রচলিত পদ্ধতির ভোটদানের চেয়ে মেশিনে ভোট দেয়া অশিক্ষিত লোকদের জন্য সহজ বলে প্রমাণিত হয়েছে। মেশিনে বা তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে ভোটদানে আরও যেসব সুবিধার কথা বলা হয়েছে তার মাঝে আছে ভোটের নিরাপত্তা, ভোটযন্ত্রের বহনযোগ্যতা এবং নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা। কেউ কেউ বলেন, এ পদ্ধতির ভোটদানের জন্য যন্ত্র বাবদ ব্যয় হবে অনেক টাকা। ভারতে শুরুতে একটি ভোটিং যন্ত্র তৈরি করতে খরচ পড়ত ৫৫০০ রুপি। এখন সেটি প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। আমি বাংলাদেশের টাকায় একে বর্তমান বাজার দরে ৫ হাজার টাকার বেশি দাম পড়বে বলে মনে করি না।

আমরা দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ডিজিটাল ভোটিং মেশিনের সক্ষমতা সম্পর্কে জেনেছি। আমার নিজের কাছে মনে হয়েছে সেটি একেবারে নির্ভুল উপায় উদ্ভাবন করেছে। বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতিতে ভোটার যাচাই করার পদ্ধতি থাকার ফলে বস্তুত জাল ভোট প্রদান, ভোটকেন্দ্র দখল, ব্যালট বাক্স ছিনতাই ইত্যাদির সম্ভাবনা শূন্যের কোঠায় নেমে গেছে।

বিএনপি তার বক্তব্যে নিরক্ষর মানুষদের ভোট জাল করার আশঙ্কার কথা বলেছে। এটিও বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রথমত, বাংলাদেশে শিক্ষার হার শতকরা ৭১। এর মানে শতকরা ২৯ ভাগ মানুষ এখনও নিরক্ষর। যদি উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় তবে দেখা যাবে, এই ২৯ ভাগ মানুষও অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মোবাইল প্রযুক্তি ব্যবহার করে। তারা এমনকি কাগজবিহীন মোবাইল ব্যাংকিংও ব্যবহার করে। নিজে পড়তে না পারলেও তারা এমনকি কারও ফোন নাম্বার সংরক্ষণ করে রাখে এবং সেই নাম্বারটি ডায়ালও করতে পারে। ডিজিটাল ভোটিংয়ের জন্য তার প্রয়োজন হবে একটি স্মার্টকার্ড, যেটি দিয়ে সে তার নিজের পরিচয় শনাক্ত করতে পারবে। অন্যদিকে ভোটিং যন্ত্রে বায়োমেট্রিক্স যাচাই করার ব্যবস্থা থাকায় স্মার্টকার্ড ছাড়াও সে তার পরিচয় শনাক্ত করতে পারবে। ভোট দেয়ার সময় তাকে শুধু একটি মার্কায় আঙুলের টিপ দিতে হবে। আমি ধারণাও করতে পারি না যে, বিএনপি নেতারা এই কাজটি আমাদের দেশের মানুষ করতে পারবে না বলে কেন ধারণা করছেন। এটি একজন অতি সাধারণ মানুষও বুঝে যে, নির্বাচন ব্যবস্থা ডিজিটাল হলে আমাদের সময় বাঁচবে, খরচ কমবে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা তৈরি হবে। গত নির্বাচনের আগে শুধু ছবিসহ ভোটার তালিকা তৈরি করার ফলে কোটির মতো ভুয়া ভোটার বাদ পড়ে, যে ভোটাররা বিএনপির হাতে জন্ম নিয়েছিল। কাগজের সাধারণ তালিকায় যারা অবাধে থাকতে পারত, ছবিসহ ভোটার তালিকায় তারা থাকতে পারেনি। এখন তো আরও মুশকিল কাজ। যেহেতু বায়োমেট্রিক্স যাচাই করা সম্ভব, সেহেতু ডুপ্লিকেট বা জাল হওয়ার সুযোগই নেই। আমরা বরাবরই বলে আসছি, ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করা শুধু কাজের সুবিধার জন্য নয় বরং স্বচ্ছতা ও জবাবহিদিতা তৈরি করাও ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের অন্যতম কারণ। আমরা যাদের কাছ থেকে গণতন্ত্রের বাণী শুনি তাদেরকে বুঝতে হবে নির্বাচন হচ্ছে গণতন্ত্রের একটি বড় ভিত্তি। সেই নির্বাচনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হলো একটি সঠিক ভোটার তালিকা। একই সাথে এটিও নিশ্চিত করা যে, ভোটদান যেন সঠিক হয়।

আমরা এটি ভাবতে পারি না যে, ভোটার তালিকা সঠিক না করে, ভোটদান পদ্ধতি সঠিক না করে গণতন্ত্র চর্চা করা যেতে পারে কেমন করে। আমরা জানি যে, প্রথম কাজটি আমরা এরই মাঝে পুরোই সফলতার সাথে সম্পন্ন করতে পেরেছি। ছবিসহ ভোটার তালিকা থেকে স্মার্টকার্ড পর্যন্ত যাত্রাপথে নানা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে এখন ভোটারের পরিচিতি বিষয়ে শতভাগ নিশ্চয়তা দিতে পারি আমরা। এখন যদি ভোটদান পদ্ধতিটি ডিজিটাল করা যায়, তবে ভোটার তালিকার সাথে ভোটদানের বিষয়টি সমন্বিত করা যেতে পারে।

ডিজিটাল ভোটিংয়ের মাধ্যমে একটি চমৎকার সুযোগের কথাও এখানে উল্লেখ করতে চাই। স্থানীয় সরকারের নির্বাচনে কোনো এক এলাকায় এবং জাতীয় নির্বাচনে অন্য এক এলাকায় ভোট দেয়া যেতে পারে। এখন যে বাংলাদেশের অনিবাসীরা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন না, তার অন্যতম কারণ হচ্ছে ভোট দেয়ার এনালগ পদ্ধতি।

আমাদের ছবিসহ ভোটার তালিকা এবং জাতীয় পরিচয়পত্র যেহেতু ল্যাপটপ দিয়ে করা হয়েছে এবং যেহেতু উপজেলা পর্যায়ে তথ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে এবং যেহেতু সারাদেশই ইন্টারনেটের আওতায় আছে, সেহেতু আমরা এমনকি ভোটিং মেশিন না কিনে ভোটার তালিকার জন্য কেনা ল্যাপটপগুলোকেই ভোট দেয়ার যন্ত্রে রূপান্তর করতে পারি। ল্যাপটপগুলোর সাথে একটি ডিজিটাল ব্যালটপত্র যুক্ত করে ডাটাবেজ সফটওয়্যার দিয়ে পুরো ভোটদান প্রক্রিয়া নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় প্রস্তুত করা যায়। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মেশিনে ভোটদানের পাশাপাশি কাগজের ব্যালটের প্রক্রিয়ার কথা যা বলা হয়েছে, সেটিও পূরণ করা যায়। কমপিউটারগুলোর সাথে প্রিন্ট করার ব্যবস্থা এবং ব্যালট বাক্সে তা ফেলার বিকল্প ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আমরা এমনকি মোবাইল ফোনকে ভোটদানের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। এইসব যন্ত্র এখন বায়োমেট্রিক্স ডাটা শনাক্ত করতে পারে। আমি নিজে তেমন একটি ফোন ব্যবহার করি। প্রবাসীরা ইন্টারনেটে বায়োমেট্রিক্স ডাটা শনাক্ত করে নিজের ফোনে ব্যালট পেপার ডাউনলোড করে ভোট দিতে পারেন।

বিএনপি নেতারা আমাদেরকে ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণার সময়ও ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেছিলেন। আট বছরে সারা দুনিয়া আমাদের ঘোষণাকে শুধু স্বীকৃতি দেয়নি, অনুসরণ করেছে। ছবিসহ ভোটার তালিকা ও স্মার্টকার্ড তৈরি করে আমরা দুনিয়াতে অন্যতম নেতৃত্বদানকারী দেশ হিসেবে প্রশংসিত হয়েছি। জাতীয় পর্যায়ে ডিজিটাল ভোটিং পদ্ধতি চালু করে আমরা এই ক্ষেত্রেও দুনিয়াকে পথ দেখাতে পারি কজ

*ফিডব্যাক : mustafajabbar@gmail.com*


## বিনামূল্যে কমপিউটার জগৎ-এর পুরনো সংখ্যা

কমপিউটার জগৎ। দেশের প্রথম বাংলা তথ্যপ্রযুক্তি সাময়িকী। বিগত ২৬ বছর ধরে কোনো রকম বিরতি ছাড়া আমরা এটি প্রকাশ করে আসছি। সেই সূত্রে এটি বাংলাদেশের সিকি শতাব্দীর তথ্যপ্রযুক্তি ও নানা ঘটনাপ্রবাহের দলিল। কমপিউটার জগৎ বরাবর বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের এক হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত। আমরা চাই বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তির অনন্য ইতিহাস বৃহত্তর পাঠক সমাজের কাছে পৌঁছে যাক। তাই আমরা দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পাঠাগারকে বিনামূল্যে কমপিউটার জগৎ-এর পুরনো সংখ্যার সেট উপহার দিতে চাই।

পুরনো সংখ্যা পেতে আগ্রহী পাঠাগারকে এ ব্যাপারে কমপিউটার জগৎ-এর প্রকাশক বরাবর আবেদনের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। আবেদনের সাথে অনূর্ধ্ব ১০০ শব্দের পাঠাগার পরিচিতি সংযোজন করতে হবে। পাঠাগারের মনোনীত ব্যক্তি আবেদন ও আইডি কার্ডসহ নিম্ন ঠিকানায় উপস্থিত হয়ে পুরনো ১২ সংখ্যার একটি সেট হাতে হাতে নিয়ে যেতে পারবেন।

যোগাযোগের ঠিকানা : বাড়ি নং-২৯, রোড নং-৬, ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৫। মোবাইল : ০১৭১১৫৪৪২১৭